রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ বৈশাখ ১৪২২
১৪ এপ্রিল ২০১৫

বাণী

আজ পহেলা বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ। শুভ নববর্ষ। নববর্ষের এই আনন্দঘন দিনে আমি দেশবাসীকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

চৈত্রের অবসানে নতুনের বার্তা নিয়ে আমাদের জীবনে বৈশাখের আগমনী সুর বেজে ওঠে। সে সুর নতুনকে বরণ করার, পুরাতনকে পেছনে ফেলে নব উদ্যমে আগামীকে আবাহন করার। বৈশাখ শুধু ঋতুচংক্রমণের ধারাবহিকতা নয় বরং আমাদের ঐতিহ্যচেতনারই নাম। বাংলা সনের উদ্ভব ও বিকাশ প্রক্রিয়া লক্ষ করলে আমরা দেখবো অসাম্প্রদায়িক মোগল সম্রাট আকবর ফসলি সন হিসেবে বাংলা সন গণনার সূত্রপাত করেন যা কালক্রমে বৃহত্তর বাঙালির অস্তিত্বসূচক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা সন গণনার সঙ্গে যেমন ফসল ও মৃত্তিকার ভাবনা জড়িত তেমনি বাংলা নববর্ষ উৎসবও মূলত তৃণমূললগ্ন এক জনউৎসবের প্রতীক।

শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বাংলা নববর্ষ উৎসবের কোনো তুলনা নেই। সারাদেশের বৈশাখি মেলাগুলোতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্যের যে বিপুল বিকিকিনি ঘটে তা জাতীয় অর্থনীতিকে বেগবান করার পাশাপাশি মানুষের মাঝে মৈত্রী, সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অতীতের সব গ্লানি ও বিভেদ ভুলে বাংলা নববর্ষ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের ঐক্য ও সংহতি আরও সুদৃঢ় করবে এবং বয়ে আনবে অফুরন্ত আনন্দের বারতা, বাংলা নববর্ষে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

বাংলা নববর্ষ ১৪২২ সবার জন্য শুভ ও কল্যাণকর হোক।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ বৈশাখ ১৪২২
১৪ এপ্রিল ২০১৫

বাণী

বাংলা নববর্ষ ১৪২২ উপলক্ষে আমি দেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত সকল বাঙালিকে জানাই নববর্ষের শুভেচ্ছা।

পহেলা বৈশাখ এমন একটি উৎসব যা ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি-পেশার সকল বিভেদ মুছে দিয়ে বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে। বছর গণনার পর্ব পেরিয়ে পহেলা বৈশাখ আজ বাঙালির জাতিসত্তা-পরিচায়ক অনন্য উৎসবে রূপ নিয়েছে। পহেলা বৈশাখের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রামকে নব নব প্রেরণা জোগায় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি যেন উৎসবের রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে এই দিনটিতে। বাঙালির আত্মপরিচয়বাহী এই সর্বজনীন উৎসব দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

পুরনো বছরের গ্লানি মুছে গিয়ে নতুন বছর আমাদের সামনে উন্মোচন করুক সম্ভাবনা ও সাফল্যের নবদিগন্ত।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান নূর, এমপি

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৫ চৈত্র ১৪২১
১৯ মার্চ ২০১৫

হৃৎকথন

নববর্ষ বাঙালির সর্ববৃহৎ বিশ্বাসনিরপেক্ষ আয়োজন। সৌভ্রাতৃত্বের পবিত্র বোধ এদিন আমাদের শুদ্ধপরিশুদ্ধ করে। আমরা এদিন সুবাসিত হই এবং প্রাণরস ও মর্মতেজে উজ্জীবিত হই।

এদিনের উদ্‌যাপন আমাদের প্রণোদিত করে ফেলে আসা দিনের সাফল্যব্যর্থতার আলোয়কালোয় ও আলোছায়ায় বিশ্লেষণব্যবচ্ছেদ করে বর্তমানের চাতালে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে এবং স্বপ্নসম্ভাবনা ও পরিকল্পনার ছবি আঁকতে। আন্তরিকতায় ও শ্রমনিবিড়তায় আমরা তাই যেন করতে পারি।

বর্ষপ্রারম্ভের প্রার্থনা, আমাদের সবার জীবন অর্থপূর্ণ হোক। ধূলিপরে ও আকাশতলে সংসারের সর্বসুন্দর দেশে আমরা সবাই যেন শান্তিতে থাকি; সকল অশুভ, অকল্যাণ ও নষ্টচিন্তাকে আমরা যেন পদতলে চূর্ণ করি। সকল নম্রতায় ও ভালোবাসায় দেশের মানুষকে অন্তরনিলয়ের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা জানাই।

চিরজীবী হোক বাংলাদেশ
মাতৃভূমি আমার স্বদেশ।

ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি

নতুন বছর : নতুন দিন

সৈয়দ শামসুল হক

আজ একটি দিন। নতুন দিন! বছরের প্রথম দিন। কাল একটি দিন ছিলো। গত বছরের অন্তিম দিন। তাই বলে কি পুরনো দিন? না, কালকের দিনটিকে বলছি গতকাল। আর, আজকের দিনটি আজকের। কালকের তুলনায় আজকের দিনটিকে যদি বলি আগামীকাল, তাহলে তার অর্থ সামান্য থেকে অসামান্যে পৌঁছোয়। ওই আগামী শব্দটাই বিপুল বিশাল এক বিস্তার চায়।

আগামী! সে তো আমাদের অর্জন করে নেবার অপেক্ষায়! স্বপ্ন, স্বর্ণ, স্বর্গ–কতকিছুই না আমাদের প্রত্যাশা–আগামীতে হবে। কিন্তু তার জন্যে উদ্যম চাই, প্রেরণা চাই, তবেই তো সত্য হবে আগামী। শ্রম চাই, ঘাম চাই আর তা মোটেই বৃথাপাতে নয়, ইতিহাসের বোধ চাই, মূল্যবোধের জাগরণ চাই, আদর্শ ধরে রাখা চাই–বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বার আদর্শ ও তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া চেতনা, চাই আমাদের চলে যাওয়া দিন থেকে নেবার মতো শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সত্যগুলো। চলে যাওয়া বছরটির তিনশ পয়ষট্টি দিন মাত্র নয়, সমূহ অতীতের সবগুলো বছরের সবকটা দিন থেকে সারাৎসার নিয়েই কিন্তু আগামীর প্রকৃত আবির্ভাব। এই আগামীর দিকে, গ্রামবাংলার দিকে তাকিয়ে– যে-বাংলা সত্যকার বাংলা–আমার মনে আসে বাঙালির চিরন্তন এই ছবি :

বৈশাখের সকালেই শিশু রোদ উঠেছে রক্তিম ও সোনালি, জাংলায় আনাজ লতা, লাউ এক জালি, উধাও আকাশে ঘুড়ি লাল নীল সবুজ হলুদ, জ্বাল হচ্ছে কাউনের খুদ, বালিকার লাল নীল চুড়ির বায়না, বধূটির কাঠের আয়না, বৈশাখি মেলায় যাবে আজ ওরা নতুন বছরে–হলুদ মাজন রাঙা পিনন কাপড়ে ছিন্নতা সেলাই করে, আমগাছে মাতা পাখি নীড়ে, মাঠের আলিতে পথ-মানুষের ভিড়ে–এইসব নিয়ে আজও বাঙালির নকশি কাঁথায় সুখ আর দুঃখ দুটি ফুল তোলে রঙিন সুতায়। কল্পনায় আমি চেয়ে দেখি অপলক : এত যে উত্থান আর এত যে আঘাত তবু লোক হেঁটে যায় মেলা অভিমুখে। উন্মুখ হৃদয় এক সবুজ ঘাসের শিষ রোদপোড়া বুকে আজও তার মাথা তোলে মাতৃভূমি আমার বাঙলায়। রোদ্দুরে

প্লাবিত হয় নদী আর ইতিহাস পারানির মাঝি নৌকা বায়।

এই ছবি চোখে নিয়ে আমি নতুন বছরের ভোরে পাতলা কুয়াশা জড়ানো দিনের সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখছি। আকাশ ক্রমে লাল হয়ে উঠছে। সোনালি নয়, লাল! এ যেন যুদ্ধজাত বাংলাদেশের– একাত্তরের রণাঙ্গন থেকে রাজপথের আন্দোলন অবধি–ইতিহাসেরই রক্তমাখা লাল। এই রক্তস্পর্শ থেকেই হতে হবে আমাদের আগামীর নির্ণয়। আমাদেরও হেঁটে যেতে হবে মানুষের মিলন মেলায়। এই ইতিহাস স্পর্শ থেকেই আমাদের উঠতে হবে পারানির নৌকোয়–এ বোধ থেকে আমরা যেন সরে না আসি–কখনোই কিংবা এক মুহূর্তের জন্যেও।

উদ্বোধিত হোক নতুন দিন, আগামী দিন, সমুখের উজ্জ্বল দিন। বাংলাদেশের রক্তাক্ত অভ্যুদয়ের পরে, জাতির জনকের হত্যা ও স্বৈরশাসন ও ছদ্মগণতন্ত্রের কাল পেরুনোর পরে, বহুদিন পরে, বহু বিপর্যয়ের পরে, আমরা আবার ইতিহাসের পথে স্থাপিত হয়েছি। এটা অমনিতেই হয়নি, মানুষেরই সচেতন পদক্ষেপে সম্ভব হয়েছে। সকল বাধা বিপত্তি ও দেশচেতনা ঘাতকদের ভুল রাজনীতির বিপরীতে আমাদের এই অর্জন ও স্থাপন যেন অটুট থাকে, অগ্রগমন যেন অক্ষুণ্ন ও বেগবান থাকে। রক্তের লাল যেন সোনার রঙে রূপান্তরিত হয় অচিরে।

হবে! আমাদেরই হাতে হবে! এই বীর বাঙালি জাতি পড়ে থাকবার নয়। এই বাণী নিয়েই নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে আজ ভোরে আমি বাঙ্ময় হতে দেখছি ॥

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ বৈশাখ ১৪২২
১৪ এপ্রিল ২০১৫

বাণী

বাংলা নববর্ষের এই শুভক্ষণে আমি দেশবাসী ও প্রবাসী বাঙালিসহ সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির এক বর্ণাঢ্য উৎসব ও অনন্য উৎস বিন্দু। বাঙালির সার্বজনীন উৎসব নববর্ষকে তাই আমরা আবাহন করি প্রাণের স্পন্দনে, গানে-কবিতায়, আবেগের উত্তাপে।

নববর্ষ মানেই নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হওয়ার দিন। আমাদের লেখক, কবি, শিল্পীদের ছন্দ, বর্ণ, তুলি ও সুরে বাংলা নববর্ষ প্রতি বছর নতুন রূপে হাজির হয়। পহেলা বৈশাখের পূর্বে চৈত্রসংক্রান্তি থেকে দেশের নানাস্থানে শুরু হয় বৈশাখি মেলা ও আড়ংসহ নানা আয়োজন; যা বিনোদনের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে আনে নতুন গতি।

বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয়তাবোধ ও চেতনাকে শানিত করে। বর্ষবরণের উৎসবে এ চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্য স্বাধীনতার আগে ও পরে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। আঘাত করা হয়েছে বার বার। বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক শক্তির কোনো অপচেষ্টাই সফল হয়নি। বাঙালি জাতি নববর্ষকে ধারণ করেছে তার জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে।

আমি আশা করি, পহেলা বৈশাখে বাঙালি সংস্কৃতির এ চর্চা আমাদের জাতিসত্তাকে আরও বিকশিত করবে। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি জোগাবে। রাজনীতির নামে আগুনে পুড়িয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা ও দেশের সম্পদ ধ্বংসকারী অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে আরও ঐক্যবদ্ধ করবে।

দেশব্যাপী বৈশাখি মেলা, চৈত্রসংক্রান্তির পালা-পার্বণ, নববর্ষের প্রতিটি মিছিল-শোভাযাত্রা পরিণত হোক মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বৈষম্য এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ারে। ১৪২২ সন সকল জরা ও গ্লানি মুছে বাঙালির জীবনে বয়ে আনুক সুখ, সমৃদ্ধি ও অনাবিল আনন্দ –এই প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নববর্ষ ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

আসাদ চৌধুরী

নববর্ষের প্রথম দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ কী! পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বছরের পয়লা তারিখটিকে ঘিরে নানা আয়োজন, নানা আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অবশ্যই অঞ্চল বিশেষে, ধর্মীয় প্রভাব যে পড়ে না, এমন নয়। ইরানের নওরোজের সঙ্গে পশ্চিমের নববর্ষের ফারাক অনেক' এমনকি আমাদের মতো দেশেও ইংরেজি নববর্ষের আগের রাতে হৈ হুল্লোড় থামানোর জন্য অতিরিক্ত সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হয় তারপরেও যে অঘটন ঘটে না এমন নয়।

এ-দিক থেকে আমাদের নববর্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের। রূপান্তর ঘটছে শাপলা-দোয়েলের দেশেও, অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এই রূপান্তরের চোখে পড়ার মতো দিকগুলি নিয়ে তেমন ভাবনা-চিন্তা হয়েছে এমনটি জোর গলায় বলতে পারছি কই? বছর চল্লিশ আগেও দেখেছি, কোনো কোনো মুসলিম পরিবারে পয়লা বৈশাখ নিয়ে কোনো কিছুর আয়োজন করাকে সরাসরি হিন্দুয়ানি প্রবণতা হিসেবে শনাক্ত করার জেদ। বিত্তবান শিক্ষিত পরিবারগুলো এর মধ্যে গ্রাম্যতার অনেক উপাদান পেতেন বলেই হয়তো এ ব্যাপারে উদাসীনতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। মজার ব্যাপার যেটা লক্ষ করেছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই প্রতিবছর নতুন প্রজন্ম, সৃজনশীলতার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীবৃন্দ নতুন কিছু একটা যোগ করেছেন। পত্র-পত্রিকায়, বেতার-টেলিভিশনে, অর্থাৎ প্রচার মাধ্যমে এই দিকগুলোকে হাইলাইট করা হচ্ছে।

আমার মনে হয়, একটু গোড়া থেকেই শুরু করলে যে ইশারাগুলো বিবেচনার জন্য হাজির করেছি, একটু হয়তো খোলাসা হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি পেয়ে প্রশাসনে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে অনেক পরিবর্তন আনলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে সামন্তবাদী শিকলটি ঘোড়ার দড়ির মতোই দেশবাসীর গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সম্রাট আকবরের আমলে ভূমি-জরিপের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি-প্রশাসনের ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রগতি হচ্ছিল তা আর বাড়েনি। আকবর প্রবর্তিত বাংলা সনের সঙ্গে যুক্ত হলো ইংরেজি সন। দুবার পতাকা বদলালেও আমাদের কৃষককুল, আড়ৎদার-ব্যবসায়ীরা এই বাংলা সনকেই মান্য করে আসছিল, এমনকি এই ইন্টারনেট-কম্পিউটার যুগেও। তা চলছে খাজনাপাতির সুবিধার জন্য। বাংলা সন চালু হয়েছিল, দেনা-পাওনার জন্য হালখাতার কাজেও লেগে গেল। বাংলা সনের আধুনিক প্রয়োগের দিকটি গুরুত্ব পাওয়ায় সিরাজী প্রবর্তিত রীতিকে আরো খানিকটা উন্নত করে দুপণ্ডিতপ্রবর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তায় একটা আধুনিক ক্যালেন্ডার দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। পাকিস্তানি আমলে আরো বছর পনেরো-ষোলো আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সরকারি কাজে-কর্মে বাংলা সন ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে এই নতুন ক্যালেন্ডার সামনে রেখেই। বোঝাই যাচ্ছে, সুবাতাস বয়ে যাচ্ছে।

আসলে তা নয়। পাকিস্তানি আমলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি জিম্মি করার যে ষড়যন্ত্র ছিল, বাঙালির আত্মপরিচয়ের চিহ্নগুলো মুছে ফেলার যে চক্রান্ত চলছিল, তা কখনো নীরবে-নিভৃতে ঘটেছিল, আবার কখনো অস্ত্রের ভাষায়। সেই নীল নকশার মোহন মায়ায় কেউ কেউ এখনো বুঁদ হয়ে আছেন সন্দেহ নেই। আমি আমাদের অগ্রজ ভাষা সংগ্রামীদের কাছে যেমন, তেমনি অগ্রজ সংস্কৃতিকর্মীদের কাছেও প্রবলভাবে ঋণ-স্বীকার করি। তাদের দৃঢ়তা এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমাদের সৌভাগ্য, জনগণের কণ্ঠ সংলগ্ন নেতৃবৃন্দ এই সংস্কৃতিকর্মীদের অকুণ্ঠ সমর্থন সবসময় পেয়েছেন, উল্টোটাও ঘটেছে, তাঁরাও সমর্থন দিয়েছেন সংস্কৃতিকর্মীদের। নইলে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কী দায় পড়েছিল ঢাকা থেকে সংস্কৃতি প্রতিনিধি দলকে করাচি নিয়ে যাওয়ার? ফল একটা হয়েছিল, শেরে বাংলা' মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এঁদের প্রত্যেকের কপালেই ভারতের দালাল, রাশিয়ার দালাল এ-সব তকমা জুটেছে, আর শেখ মুজিবুর রহমান তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হয়ে আলো ছড়িয়ে দিয়ে হলেন সকলের বঙ্গবন্ধু। জনগণের কণ্ঠসংলগ্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপকে শিল্পসাহিত্য উৎসাহ দেবেই। ষাটের দশকেই বাঙালি সংস্কৃতির জন্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে আগ্রহ প্রবল হতে থাকে। একবারেই গোঁড়ায় ১৯৬১ তেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। '৬৫-র সীমান্ত সংকটের পর পরই ছয় দফা-'৬৯-এ ১১ দফা এবং সেই জয় বাংলা, সেই আনন্দ–জেগেছে জেগেছে বাঙালি জেগেছে ইত্যাদি।

আইয়ুবের বৈদেশিক ঋণের কল্যাণে ভুল-প্রাচুর্যের সমাজেও তরঙ্গটি চলেছে, নতুন করে কলার মোচা কীভাবে রাঁধতে হয়, কচি কাঁঠালের তরকারি যে মাংসের মতো রান্না করা যায়, বিরিয়ানি খাবারের পাশে, নুডলস স্যুপের পাশে এ-ও ছিল অবলোকনের ব্যাপার। সে-সব উত্তাল সময়ে, মহান একুশে ফেব্রুয়ারির মতোই অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল দেশপ্রেমিকদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল বাংলা নববর্ষ পালন।

রাজনীতিবিদদের চেয়েও আমাদের সংস্কৃতিকে যাঁরা এগিয়ে নিচ্ছেন সচেতনভাবে তাঁরা নির্ভুলভাবে এগিয়ে এলেন দৃঢ় পদক্ষেপে। রেসকোর্সে স্থাপিত হলো অস্থায়ী চিহ্ন। বিজয় দিবসে শহীদ মিনার থেকে বিজয় মিছিল, চট্টগ্রাম শুরু করে দিল বিজয় মেলা–সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল তার আলোকদৃষ্টি। আর কেন্দ্রে রইল পয়লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। যারা রোজ খাস্তা খায় আমানি খায়, অথবা, তাও প্রতিদিন যাদের জোটে না তাদের সঙ্গেই একাত্ম হতে চাইলেন তরুণ সমাজ। গ্রাম্যতার দোহাই দিয়ে ঠেকানো গেল না, আর্ট কলেজ থেকে বেরোলো বর্ণিল সমারোহ, সমাবেশ-শোভাযাত্রা, সোনারুপা ভেজানো জল না ছড়ালেও, সোনার চেয়ে দামি এই মাটিতে বসেই রমনা বটমূলে ছায়ানটের পরিবেশনায় গান শোনে তৃপ্তির সঙ্গে। ছোটো বেলায় পুণ্যাহের সময় লাঠি খেলায় যে বীরত্ব দেখতাম, তা নয়, বরং রমণীয়-লাবণ্যময় নৃত লাঠি খেলাকে ঘিরেই আসর মাড়ায়, জব্বারের বলী খেলায় আসে নতুন তরঙ্গ। কৌটার দুধ খেলেও গুরু-মোষের শিঙে তেল-সিঁদুরও জুটে যায়। বাতাসা-কদমা, চিড়ে-মুড়ি, নাড়ু আর নকুলদানা, মোয়া-কদমা আইসক্রিম আর নুডলসের ভ্যানের পাশে বেশি ডাট মেরেই হাজির হয়।

এক চৈত্রে যেমন মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশ দেখে বুক জুড়িয়ে গিয়েছিল, তেমনি দিনের পর দিন হরতাল, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ আর এই সংস্কৃতিতে নতুন যোগ রেলগাড়ির পাত তুলে নেওয়া। টান-টান উত্তেজনা, টেনশন, সন্দেহ-অবিশ্বাস সর্বত্রই বিশ্বাস ও আস্থার অভাব কারো বক্তব্য শোনারও ফুরসত নেই কারো-রাজনীতির এই হাল বিস্মিত বিমূঢ় জনগণ অবলোকন করায়ও বাধ্য হচ্ছে। মরছে তো রিকশা-শ্রমিক আর হরতালের আওতামুক্ত চা-খানার খেটে খাওয়া ছেলেটিই। মরার ফাঁদ পাতা হয়েছে রেলযাত্রীদের জন্যই। এতে কারা লাভবান হবেন? সমাজ-বিরোধীদের এই সুযোগটাই নিচ্ছে বিশ্বায়নের এই প্রহরে আকাশ-সংস্কৃতির প্রবল দাপটের মধ্যে আমাদের সামনে এসেছে পহেলা বৈশাখ। সকলকেই নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। যারা অসুস্থ, রোগ-শোকে কাতর–তারা যেন আরোগ্য লাভ করেন, যাদের কপালে দুশ্চিন্তার গাঢ় প্রলেপ, তা মুছে গিয়ে প্রসার ঘটুক, মনে-প্রাণে তা কামনা করি।

বাংলা নববর্ষ : ইতিহাস ও ইতিহাসের গ্রন্থি

আবুল মোমেন

বাংলা নববর্ষ ইতিহাসের গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে এ বাংলাদেশে সমকালের বিষয় হয়ে উঠেছে, গ্রামের কৃষিসমাজ ছাড়াও নাগরিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। শোনা যায়, বাদশাহ আকবরের সময় বাংলা সন প্রবর্তিত হয়েছিল। সেটা হিজরির ৯৬৩ তম বর্ষ, ইংরেজি সম্ভবত ১৫৫৬ সন।

আকবর কেবল দূরদর্শী শাসক ছিলেন তা নয় সৃজনশীল মেধা খাটিয়ে নানা ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী সুফল আনতে চেয়েছিলেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন।

কৃষি-প্রধান বাংলায় চান্দ্রমাসভিত্তিক দিনপঞ্জির ওপর নির্ভর করার বাস্তব অসুবিধার দিকটা হয়ত তাঁর রাজস্ব কর্মকর্তারাই বাদশাহর কানে তুলে থাকবেন। তাঁর তুখোড় রাজস্ববিষয়ক উজির রাজপুত তোডরমল্লই এ কাজে ভূমিকা রেখেছিলেন কিনা তা কোনো ইতিহাসবিদ খতিয়ে দেখতে পারেন।

শুরুর সময় বাংলা সন ও হিজরি সন একই থাকলেও–অর্থাৎ ৯৬৩ সন– চান্দ্রবর্ষ যেহেতু চাঁদের আবর্তনের ওপর গণনা করা হয় তাই এর বর্ষ হয় ইংরেজি বর্ষের চেয়ে অন্তত দশ দিন কম। সাড়ে চারশ বছরে অপেক্ষাকৃত ছোট বছরটির সংখ্যা গেছে বেড়ে–এবারে বাংলা ১৪২২ সন চালু হলেও হিজরির চলছে ১৪৩৬ সন। প্রথম পর্যায়ে বছর শুরু হতো অগ্রহায়ণ থেকে, মৌনী তাপস বৈশাখের প্রথম মাসের মর্যাদা ছিল না। বোঝা যায় কৃষিসমাজের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নতুন দিনপঞ্জিটির সংস্কার হয়েছে। সংস্কারের কাজ হাল আমলেও যে হয়েছে তা আমরা সবাই জানি–পাকিস্তান আমল থেকে নিয়ে বাংলাদেশ আমলে এসে এর ছোটখাট অনিশ্চয়তা দূর করে মাসগুলোকে প্রণালিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। তাতে পঞ্জিকার সাথে এই দিনপঞ্জির মিল থাকছে না। সমাজের হিন্দু-বৌদ্ধরা পুজো-পার্বণ ব্রত-আচারের জন্যে সনাতন পঞ্জিকার ওপরই নির্ভর করছেন বটে, তবে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক উৎসবে-অনুষ্ঠানে আধুনিক সংস্কারকৃত ক্যালেন্ডারই তাঁরাও অনুসরণ করছেন।

কিন্তু এইখানে স্মরণ করা যুক্তিযুক্ত হবে যে বিশাল একটা অঞ্চল জুড়ে যেমন বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছে তেমনি গৌতমবুদ্ধের জন্ম ও প্রয়াণ তিথির স্মরণে পালিত হয়ে এসেছে বৈশাখি। এ ঐতিহ্য দু হাজার বছরের বেশি হবে। আর তা মৈত্রীবন্ধনে বেঁধেছে কত জনপদ ও জনগোষ্ঠীকে ভাবা যায়! জাপান থেকে চীন হয়ে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে বৈশাখি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে, মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান তীর পর্যন্ত ছিল এর চল, এদিকে আফগানিস্তানসহ পুরো উপমহাদেশেই বৈশাখির আয়োজন চলে আসছে। আমাদের আশেপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো যে বৈশাখি বা বৈসাবি উৎসবে মেতে ওঠে তাও তো একই স্মৃতির প্রদীপকেই উশকে দেয়।

ফলে বাংলা নববর্ষ যদি পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন হয়ে থাকে তবে এ প্রসঙ্গ সম্রাট আকবরে এসে থেমে গেলে কি চলবে? বাংলা তো এক সময় বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ ছিল, পাল সম্রাটরা ছিলেন বৌদ্ধ, অন্তত ততদিন কি এ অঞ্চলে বৈশাখি উদ্‌যাপিত হয়নি? বাংলা নববর্ষ এবং বৈশাখি নিয়েও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোনো ছাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গবেষণায় লিপ্ত হতে পারেন।

ফিরে আসি এবার আমাদের একালের নববর্ষ উদ্‌যাপনের আলোচনায়। দেশের নাগরিক সমাজের উদ্যোগে ও বিপুল অংশগ্রহণে দেশে সত্যি সত্যি এখন বাংলা নববর্ষ এক সামাজিক উৎসবের রূপ নিয়েছে। ছোট ছোট মফস্বল শহরেও তা ছড়িয়ে পড়ছে।

চৈত্র-বৈশাখ মিলে এখনও গ্রামে গ্রামে প্রচুর মেলা ও উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। এ সবে ধর্ম-নির্বিশেষে গ্রামের মানুষ এখনও অংশ নিয়ে থাকেন। তবুও এর মধ্যে নিশ্চয় পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এবং মেলার পণ্যের মাটির জিনিসের বদলে প্লাস্টিক সামগ্রীর চল বেড়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কাল থেকেই বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি একটা আবেগের টান তৈরি হয়েছিল। তার চর্চা হয়েছে প্রধানত একুশে ফেব্রুয়ারি ও বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে। একুশে উদ্‌যাপনের আয়তন যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে নববর্ষ আবাহনের আয়োজন ও আড়ম্বর। মানুষের ঢল নামছে রীতিমত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। অংশগ্রহণ উৎসব-অনুষ্ঠানের সাফল্যের একটা মাপকাঠি অবশ্যই এবং সে হিসেবে আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার বহিঃপ্রকাশ যে ভালোই ঘটছে তা মানতেই হবে।

পাকিস্তানের প্রথম পর্বে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে ঘরোয়া পরিবেশে ছোট ছোট আয়োজনে মূলত সঙ্গীত ও কবিতা পাঠের মাধ্যমে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হতো। প্রতিটি আয়োজন স্বতন্ত্র, খানিকটা গণ্ডি টানা থাকত আয়োজকদের পরিবারগুলোর মধ্যে। এ বড়জোর প্রগতিশীল হিন্দু-মুসলিম পরিবারগুলোর বাঙালিচেতনার সীমিত প্রকাশ। ছায়ানট ১৯৬৭তে রমনা বটমূলে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে একে কেবল মুক্তাঙ্গনে নিয়ে এলো না, দিনটিকে জাতীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপনের সূচনাও করল। দিনটি পরিবার-সংগঠন-প্রতিষ্ঠান ছাপিয়ে ক্রমেই ধর্মবর্ণনির্বিশেষে বাঙালির বিশেষ দিন হয়ে উঠতে থাকল। একুশে বাঙালির সংগ্রামী চেতনা লালনের আর নববর্ষ যেন চিরায়ত বাঙালিত্বের চেতনা লালনের দিন। ছায়ানটের সঙ্গীতভিত্তিক প্রভাতী অনুষ্ঠান সাড়া ফেলেছিল সবার মধ্যে। তারই প্রকাশ ঘটে একই আদলে শহরে শহরে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হলে। দিনে দিনে অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে, কলেবর বেড়েছে, বৈচিত্র্যও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। সঙ্গীতানুষ্ঠান, মঙ্গল শোভাযাত্রাসহ বর্ষবিদায় ও বরণের পৃথক অনুষ্ঠান, মেলা, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানমালা, পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদি মিলে সারাটা দিন ভরে ওঠে। উৎসবের আনন্দ যেন জাতির জীবনে ঢেউ খেলে যায়।

বাংলা নববর্ষকে যদি সারা বছরের সূচ